৮ জুন ২০২৬

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

"জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০২৬ (খসড়া)"–এর ওপর ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)-র পর্যালোচনা ও সুপারিশ

ভূমিকা

অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে জারি হওয়া ১৩৩টি অধ্যাদেশের মধ্যে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের বিশেষ কমিটি কর্তৃক যাচাই–বাছাইয়ের মাধ্যমে সুপারিশকৃত ৯৭টি হুবহু এবং ১৩টি অধ্যাদেশ সংশোধনীসহ আইনে পরিণত করা হয়েছে, যা সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য। তবে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন, পুলিশ কমিশন, এবং গুম প্রতিরোধসহ জনগুরুত্বপূর্ণ ১৬টি অধ্যাদেশ আইনে পরিণত না করে পরবর্তী সময়ে অধিকতর যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে নতুন করে প্রণয়ন এবং সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগ ও সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় স্থাপনসহ মোট সাতটি অধ্যাদেশ রহিত করার সুপারিশ করা হয়।

সংসদে দুই-তৃতীয়াংশ আসনে প্রতিনিধিত্বকারী বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহারে বলা হয়েছিল মানবাধিকার সার্বজনীন ঘোষণাপত্র অনুযায়ী মানবাধিকার সুরক্ষা নিশ্চিত করা হবে এবং সুনির্দিষ্ট মানদণ্ডের ভিত্তিতে মানবাধিকার কমিশন গঠন করা হবে।[১] সংসদে "জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশ, ২০২৫" পাশ না করার কারণ হিসেবে যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে, অধ্যাদেশে কিছু অস্পষ্টতা আছে, যা সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সঙ্গে আলোচনাসাপেক্ষে অধিকতর যাচাই-বাছাই করে নতুনভাবে আইনটি প্রণয়ন করা হবে। এর ধারাবাহিকতায় সরকার ১৭ মে ২০২৬ "জাতীয় মানবাধিকার আইন, ২০২৬"–এর একটি খসড়া প্রণয়ন করেছে। খসড়াটিতে কয়েকটি নতুন ধারা যুক্ত করা হয়েছে, যা ২০২৫ সালের অধ্যাদেশের তুলনায় কিছু ক্ষেত্রে উন্নততর সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে। এর মধ্যে রয়েছে:

- কমিশনার নিয়োগের ক্ষেত্রে "বাংলাদেশের নাগরিক না হওয়া ও সাজাপ্রাপ্ত হওয়াকে" অযোগ্যতা হিসেবে বিবেচনা;
- সভার লিখিত কার্যবিবরণী প্রকাশ;
- মানবাধিকার সংরক্ষণে বিদ্যমান আইনের অধীন স্বীকৃত ব্যবস্থাদির সমন্বিত পুনর্বিবেচনা;
- তদন্তকারী কর্মকর্তার জবাবদিহি;
- জাতীয় প্রতিরোধ ব্যবস্থা বিভাগের এখতিয়ার বৃদ্ধি;
- অভিযোগকারীকে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী প্রদত্ত প্রতিবেদন প্রদানসহ স্বতঃপ্রণোদিতভাবে গৃহীত অভিযোগ তদন্ত করার ক্ষেত্রে তামাদি হওয়ার মেয়াদ থেকে অব্যাহতি, ইত্যাদি।

কিন্তু খসড়া জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন ২০২৬–এ মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশ, ২০২৫–এর তুলনায় এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ তারতম্য সৃষ্টি করা হয়েছে, যা সরকারি প্রভাবমুক্ত একটি প্রকৃত স্বাধীন ও কার্যকর জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠার জন্য দীর্ঘকাল লালিত জনপ্রত্যাশার পরিপন্থী। এবং একইভাবে প্যারিস নীতিমালার[২] সঙ্গে সাংঘর্ষিক ও গ্লোবাল অ্যালায়েন্স অব ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস ইনস্টিটিউশনস (জিএএনএইচআরআই)[৩] থেকে বাংলাদেশের জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের "এ" স্ট্যাটাস প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অন্যতম প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করার ঝুঁকি তৈরি করবে বলে আশঙ্কা রয়েছে। খসড়া আইনটির যে সব ধারা স্বাধীন ও কার্যকর মানবাধিকার কমিশন গঠনের ক্ষেত্রে উদ্বেগজনক ও কমিশনের স্বকীয়তা বিনষ্টের ঝুঁকি সৃষ্টি করতে পারে, নিম্নে সে বিষয়ক পর্যবেক্ষণ তুলে ধরার পাশাপাশি যথাযথ গুরুত্বসহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সঙ্গে আলোচনাসাপেক্ষে সংশোধনের জন্য টিআইবির পক্ষ থেকে সুপারিশ করা হলো–

পর্যালোচনা ও সুপারিশ

১. খসড়া আইনের ধারা ৩(২)–এ বলা হয়েছে 'কমিশন একটি স্বাধীন সংস্থা হইবে এবং উহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা থাকিবে এবং এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার এবং হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইহা স্বীয় নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে বা ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে', যেখানে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশ, ২০২৫–এ বলা ছিল 'কমিশন একটি স্বাধীন সংস্থা হইবে যাহা সরকারের কোনো মন্ত্রণালয় বা বিভাগের আওতাধীন হইবে না'। খসড়া আইনের এই ধারায় 'সরকারের কোনো মন্ত্রণালয় বা বিভাগের আওতাধীন হইবে না' অংশটি বাদ দেওয়া হয়েছে, যার মাধ্যমে নির্বাহী বিভাগ কর্তৃক কমিশনকে করায়ত্ত করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, যা প্যারিস নীতিমালায় উল্লিখিত একটি স্বাধীন ও স্বায়ত্তশাসিত মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান গঠন এবং স্বাধীনভাবে এর দায়িত্ব পালন করার নীতির সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ।

[১] বিএনপি, 'নির্বাচনী ইশতেহার-২০২৬', পৃষ্ঠা ১০, https://www.bnpbd.org/manifesto
[২] The Paris Principles, https://www.humanrights.dk/files/media/dokumenter/about_us/The%20Paris%20Principles.pdf
[৩] গ্লোবাল অ্যালায়েন্স অব ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস ইনস্টিটিউশনস, https://ganhri.org/paris-principles/

সুপারিশ-১: খসড়া আইনের ধারা ৩(২)–এ 'কমিশন একটি স্বাধীন সংস্থা হইবে, যাহা সরকারের কোনো মন্ত্রণালয় বা বিভাগের আওতাধীন হইবে না'–এরূপ বিধান যুক্ত করতে হবে।

২. অধ্যাদেশ–এ বলা হয়েছিল 'কমিশনের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় হইবে এবং প্রতি বিভাগে ইহার বিভাগীয় কার্যালয় থাকিবে এবং কমিশন প্রয়োজনে, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ইহার কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।' কিন্তু বর্তমান খসড়ায় ঢাকার বাইরে বিভাগীয় পর্যায়ে কমিশনের কার্যালয় স্থাপনের বাধ্যবাধকতা বাদ দেওয়া হয়েছে, এবং কমিশনের কার্যালয় স্থাপনের ক্ষেত্রে সরকারের পূর্ব অনুমোদন গ্রহণের বাধ্যবাধকতা রাখা হয়েছে (ধারা-৪), যা কমিশনের স্বাধীনতাকে খর্ব করবে এবং প্যারিস নীতিমালায় উল্লিখিত জাতীয় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম নির্বিঘ্নভাবে পরিচালনার উপযোগী অবকাঠামো এবং প্রয়োজনে স্থানীয় বা আঞ্চলিক শাখা এবং কার্যনির্বাহী দল গঠন-সম্পর্কিত নীতিমালার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

সুপারিশ-২: খসড়া আইনের ধারা ৪–এ 'কমিশনের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় হইবে এবং প্রতিটি বিভাগে এর কার্যালয় থাকিবে এবং কমিশন প্রয়োজনে জেলা ও উপজেলা পর্যায়েও ইহার কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে'–এরূপ বিধান যুক্ত করতে হবে এবং কার্যালয় স্থাপনের ক্ষেত্রে সরকারের পুর্বানুমোদন গ্রহণের বাধ্যবাধকতা বাতিল করে কমিশনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা সুসংহত করতে হবে।

৩. খসড়া আইনের ধারা ৫(৩)–এ বলা হয়েছে 'কমিশন গঠনের ক্ষেত্রে বাছাই কমিটির সুপারিশে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী বা সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী বা নারীদের মধ্যে যোগ্য প্রার্থী থাকিলে তাহাকে বিশেষ বিবেচনায় রাখা যাইবে।' এক্ষেত্রে কমিশন গঠনের ক্ষেত্রে কমিশনার হিসেবে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী বা সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী এবং নারীদের অন্তর্ভুক্তির বাধ্যবাধকতা রাখা হয়নি। অন্যদিকে প্যারিস নীতিমালায় বলা হয়েছে, জাতীয় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান গঠন এবং এর সদস্যদের নিয়োগ এমন একটি কার্যপ্রণালী অনুসারে করতে হবে, যাতে মানবাধিকার সুরক্ষা ও প্রসারে সম্পৃক্ত (নাগরিক সমাজের) সামাজিক শক্তিগুলোর বহুত্ববাদী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় নিশ্চয়তা প্রদান করে। উল্লেখ্য, ২০২৫ সালের অধ্যাদেশে কমিশনারগণের মধ্যে কমপক্ষে একজন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর বা সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সদস্য এবং কমিশন গঠনের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমতা নিশ্চিত করতে কমপক্ষে দুইজন নারী কমিশনার রাখার বাধ্যবাধকতা রাখা হয়েছিল।

সুপারিশ-৩: খসড়া আইনের ধারা ৫(৩)–এ কমিশনের চেয়ারপারসন ও কমিশনারগণ নিয়োগের ক্ষেত্রে কমপক্ষে একজন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর বা সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সদস্য এবং কমিশন গঠনের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমতা নিশ্চিত করতে কমপক্ষে দুইজন নারী কমিশনার রাখার সুস্পষ্ট বিধান যুক্ত করতে হবে।

৪. খসড়া আইনে চেয়ারপার্সন ও কমিশনারগণের নিয়োগ, মেয়াদ, পদত্যাগ, ইত্যাদি বিষয়ক ধারায় [উপধারা-৬(৩)(গ)] বলা হয়েছে 'কোনো ব্যক্তি চেয়ারপার্সন ও কমিশনার পদে নিয়োগ লাভে অযোগ্য হইবেন, যদি তিনি সংসদ সদস্য, স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত পদাধিকারী, কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য হন বা, সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত থাকেন এবং কমিশনের চেয়ারপার্সন বা কমিশনার পদে মনোনীত হইলে উক্ত পদ হইতে পদত্যাগ করিবার বা, ক্ষেত্রমত স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের বিধি মোতাবেক প্রেষণ, লিয়েন বা অবৈতনিক ছুটি গ্রহণের অঙ্গীকার না করেন।' এই ধারার মাধ্যমে একজন সরকারি কর্মচারীকে স্বীয় পদে চাকরিরত থাকা অবস্থায় ছুটি নিয়ে কমিশনার হিসেবে নিয়োগের সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে, যা স্বার্থের দ্বন্দ্বমুক্ত ও নিরপেক্ষভাবে কমিশনের কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে অন্তরায় এবং প্যারিস নীতিমালার সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। এ ছাড়া, এই ধারায় কমিশনার নিয়োগে যোগ্যতার মানদণ্ড হিসেবে পেশাগত জীবনে দলনিরপেক্ষতা, মানবাধিকার রক্ষা, সততা ও শুদ্ধাচার পালনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, এমন ব্যক্তিকে নিয়োগ দিতে হবে–এই বিষয়টি উপেক্ষিত হয়েছে।

সুপারিশ-৪: খসড়া আইনে [ধারা-৬(৩)(গ)] উল্লিখিত একজন সরকারি কর্মচারীকে স্বীয় পদে চাকরিরত থাকা অবস্থায় ছুটি নিয়ে কমিশনার হিসেবে নিয়োগের সুযোগ সংবলিত বিধান বাতিল করতে হবে। একইসাথে কমিশনার নিয়োগে যোগ্যতা হিসেবে 'পেশাগত জীবনে দলনিরপেক্ষতা, মানবাধিকার রক্ষা, সততা ও শুদ্ধাচার পালনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন, এমন ব্যক্তিকে নিয়োগ করিতে হইবে'–এমন ধারা যুক্ত করতে হবে।

৫. খসড়া আইনে কমিশনার নিয়োগ বাছাই কমিটির সদস্য হিসেবে স্পীকার, দুইজন মন্ত্রী, একজন সরকারি দলের সংসদ সদস্য এবং মন্ত্রিপরিষদ সচিবকে রাখা হয়েছে (ধারা-৭)। ফলে কমিশনার নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারি দলের তথা নির্বাহী বিভাগের আধিপত্য ও ক্ষমতাসীন দলের প্রভাব প্রতিষ্ঠা এবং নিয়োগ-প্রক্রিয়ার নিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ন হওয়া ও স্বার্থের দ্বন্দ্ব সৃষ্টির ঝুঁকি তৈরি হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০২৫ সালের অধ্যাদেশে বাছাই কমিটির সদস্য হিসেবে প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মনোনীত আপীল বিভাগের একজন বিচারক (যিনি বাছাই কমিটির সভাপতি), জাতীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি বা তদকর্তৃক মনোনীত মানবাধিকার বিষয়ে সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন সাংবাদিক প্রতিনিধি এবং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী বা সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে থেকে তাদের অধিকার রক্ষায় কাজ করার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন প্রতিনিধি রাখার বিধান ছিল।

সুপারিশ-৫: খসড়া আইনের ধারা ৭-এ কমিশনার নিয়োগের জন্য বাছাই কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে 'দুইজন মন্ত্রী ও মন্ত্রিপরিষদ সচিবের' পরিবর্তে 'প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মনোনীত আপীল বিভাগের একজন বিচারক ও জাতীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি বা তদকর্তৃক মনোনীত মানবাধিকার বিষয়ে সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন সাংবাদিক প্রতিনিধিকে' মনোনীত করতে হবে এবং নিয়োগ-প্রক্রিয়ার নিরপেক্ষতা নিশ্চিতে ধারা ৭(১)–এ উল্লিখিত বাছাই কমিটির সদস্যের ক্ষেত্রে "দলীয় রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত" যুক্ত করতে হবে। সেইসাথে দফা (ছ) সংশোধন করে 'রাষ্ট্রপতি "ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী"/আদিবাসীদের অধিকার নিয়ে কাজ করে এমন ফোরাম বা প্ল্যাটফর্ম থেকে "ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী"/আদিবাসী বা অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর এক বা

একাধিক সংখ্যক প্রতিনিধির নাম আহ্বান করিবেন এবং তাহাদিগের মধ্য হইতে দলীয় রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত একজনকে মনোনীত করিবেন'–এভাবে লিখতে হবে।

৬. খসড়া আইনে চেয়ারপার্সন ও কমিশনার নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে বাছাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার বাধ্যবাধকতা নিশ্চিত করতে দাখিলকৃত দরখাস্ত যাচাই-বাছাইয়ের নৈর্ব্যক্তিক মানদণ্ড নির্ধারণ, নাম-পরিচয়সহ প্রাথমিকভাবে বাছাইকৃত প্রার্থীদের তালিকা, এবং রাষ্ট্রপতির নিকট সুপারিশকৃত ব্যক্তিদের নাম-পরিচয়সহ তালিকা, ইত্যাদি ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নিশ্চিত করার বিধান যুক্ত করা হয়নি (ধারা-৮)। তা ছাড়া, অধ্যাদেশে থাকা বাছাই কমিটি কর্তৃক সংক্ষিপ্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করার বিধানটি খসড়া আইন থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

সুপারিশ-৬: খসড়া আইনের ধারা ৮–এ স্বচ্ছপ্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে বাছাইপ্রক্রিয়া সম্পন্ন করার বাধ্যবাধকতা নিশ্চিত করতে 'বাছাই কমিটির দাখিলকৃত দরখাস্ত যাচাই-বাছাইয়ের নৈর্ব্যক্তিক মানদণ্ড, নাম-পরিচয়সহ প্রাথমিকভাবে বাছাইকৃত প্রার্থীদের তালিকা, এবং রাষ্ট্রপতির নিকট সুপারিশকৃত ব্যক্তিদের নাম-পরিচয়সহ তালিকা ইত্যাদি ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রকাশ করিবে'–এরূপ একটি উপ-ধারা যুক্ত করতে হবে। সেইসাথে ২০২৫ সালের অধ্যাদেশের অনুরূপ বাছাই কমিটি কর্তৃক সংক্ষিপ্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করার বিধানটি সংযুক্ত করতে হবে।

৭. প্যারিস নীতিমালায় জাতীয় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানের কমিশনারদের নিয়োগ-প্রক্রিয়াকে সুনির্দিষ্ট ও কাঠামোবদ্ধ করার বিষয়ে বলা হয়েছে, যেখানে বাছাই কমিটি প্রকৃত ও বাস্তব কর্তৃত্ব প্রয়োগ করতে পারে। কিন্তু খসড়া আইনে অধ্যাদেশে থাকা বাছাই কমিটি কর্তৃক প্রতিটি পদের বিপরীতে ১ (এক) জনের পরিবর্তে ২ (দুই) জন প্রার্থীর নামসহ তালিকা সুপারিশ আকারে রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণের বিধান যুক্ত করা হয়েছে (ধারা-৮), যার মাধ্যমে রাষ্ট্রপতিকে ব্যক্তিগত এবং প্রকারান্তরে দলীয় বিবেচনা প্রয়োগের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। এর ফলে বাছাই কমিটির এখতিয়ার সংকুচিত হয়ে পড়েছে।

সুপারিশ-৭: খসড়া আইনের ধারা ৮(ঘ) সংশোধন করে 'উপরিউক্ত কার্যধারা সমাপ্তির পর নিয়োগযোগ্য চেয়ারপার্সন বা কমিশনারের প্রতিটি পদের বিপরীতে ১ (এক) জন প্রার্থীর নামসহ একটি তালিকা সুপারিশ আকারে রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করিবে'–এরূপ বিধান যুক্ত করতে হবে।

৮. প্যারিস নীতিমালায় বলা হয়েছে, জাতীয় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানের ম্যান্ডেট বা কাজের এখতিয়ার যতদূর সম্ভব বিস্তৃতভাবে আইনে সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত ও নির্দিষ্ট করা থাকবে। কিন্তু খসড়া আইনে ২০২৫ সালের অধ্যাদেশে থাকা কমিশনের সুনির্দিষ্ট কার্যাবলির সংখ্যা ও পরিধি প্রায় ৫০ শতাংশ হ্রাস করা হয়েছে। কমিশনের কার্যাবলীর মধ্যে [ধারা-১৩(ঘ)] বলা হয়েছে, 'মানবাধিকার লঙ্ঘন বা লঙ্ঘনের প্ররোচনা-সম্পর্কিত কোনো বিষয়ে তদন্তকালীন বা পরবর্তী সময়ে কোনো ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করা বা কোনো স্থান, অফিস-আদালত, হাজতখানা বা আটককেন্দ্র পরিদর্শন', অর্থাৎ শুধু মানবাধিকার লঙ্ঘন বা লঙ্ঘনের প্ররোচনার ঘটনা ঘটলে, সে বিষয়ে তদন্তকালে বা পরবর্তী সময়ে কোনো ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করা বা সংশ্লিষ্ট স্থান, অফিস-আদালত, হাজতখানা বা আটককেন্দ্র পরিদর্শনের করার এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে। কিন্তু উক্ত স্থানগুলোতে কোনো মানবাধিকার লঙ্ঘন হয় কি-না তার নিয়মিত পরিদর্শন, তদন্ত বা পর্যালোচনা করার এখতিয়ার দেওয়া হয়নি। এ ছাড়া, বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা ও সেনাবাহিনীর সম্ভাব্য আটকস্থল, যেখানে গুমসহ বিভিন্ন নির্যাতনের জন্য আটককৃত ব্যক্তিদের রাখার সম্ভাবনা রয়েছে, এমন স্থানসমূহের অনুসন্ধান, পরিদর্শন ও তদন্ত করা এবং এইরূপ স্থান ও অবস্থার উন্নয়নের জন্য সরকারের নিকট প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করা, এ সকল স্থান আইনবহির্ভূত হলে, তা বন্ধ করা ও দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা-গ্রহণের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ করা ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। সেইসাথে অধ্যাদেশে অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন গুরত্বপূর্ণ কার্যাবলী যথা মানবাধিকার নিয়ে কর্মরত নাগরিক সমাজ বা এনজিওর সাথে নিয়মিত যোগাযোগ বজায় রাখা; মানবাধিকার রক্ষাসম্পর্কিত শিক্ষা কার্যক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহায়তা করা; মানবাধিকারের বিষয়ে প্রচার করা; প্রস্তাবিত আইন ও বিদ্যমান আইন পর্যালোচনা করা এবং সংশোধনের সুপারিশ করার ক্ষমতা ইত্যাদি বিষয়গুলো খসড়া আইনে বাদ দেওয়া হয়েছে। তা ছাড়া, খসড়ায় কমিশনের কার্যাবলীর মধ্যে অনগ্রসর ও ঝুঁকিপূর্ণ (ধর্মীয় সংখ্যালঘু, আদিবাসী, নারী, শিশু ইত্যাদি) জনগোষ্ঠীর অধিকার নিশ্চিতকরণ, বাস্তবায়ন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কোনো কাঠামোগত ব্যবস্থা রাখা হয়নি। এই গোষ্ঠীগুলোর অধিকার লঙ্ঘনসংক্রান্ত বিষয়গুলো কেবল তখনই সমাধান করা যাবে, যখন ব্যক্তিগতভাবে কোনো অভিযোগ দায়ের হবে। অন্যদিকে প্যারিস নীতিমালায় জাতীয় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে শুধু অভিযোগ দায়েরের ক্ষেত্রেই নয়, বরং একটি কাঠামোগত কাজ হিসেবে দরিদ্র ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর অধিকার পর্যবেক্ষণে নিযুক্ত থাকার কথা বলা হয়েছে, আইনের এই ধারা যার সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ।

সুপারিশ-৮: খসড়া আইনের ধারা ১৩-তে যেসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে সেগুলো হচ্ছে–

1. **সকল আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, গোয়েন্দা ও অনুরূপ নজরদারী সংস্থা, এবং সেনাবাহিনীর সম্ভাব্য আটকস্থল যেখানে গুমসহ বিভিন্ন নির্যাতনের জন্য আটককৃত ব্যক্তিদের রাখার সম্ভাবনা রয়েছে, এমন স্থানসমূহের নিয়মিত অনুসন্ধান, পরিদর্শন ও তদন্ত করা এবং এইরূপ স্থান ও অবস্থার উন্নয়নের জন্য সরকারের নিকট প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান এবং এ সকল স্থান আইন-বহির্ভূত হলে, তা বন্ধ করা ও দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে সরকারের নিকট সুপারিশ করা;**
2. **মানবাধিকার বিষয়ে নাগরিক সংগঠনসমূহের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ ও সহযোগিতা বজায় রাখা এবং মানবাধিকারের উন্নয়নে অংশীদারিত্বমূলক কার্যক্রম গ্রহণ;**

৩. **মানবাধিকার রক্ষাসম্পর্কিত শিক্ষা কার্যক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহায়তা;**
৪. **মানবাধিকারের বিষয়ে প্রচারণা;**
৫. **মানবাধিকার সংরক্ষণের লক্ষ্যে সংবিধান বা আপাততঃ বলবৎ কোনো আইনের অধীন স্বীকৃত ব্যবস্থাদি পর্যালোচনা করা এবং উহাদের সংশোধন, সংযোজন, পরিবর্তন, পরিমার্জন ও কার্যকর বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকারের নিকট সুপারিশ করা;**
৬. **মানবাধিকার সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও মানবাধিকার লঙ্ঘন-সংক্রান্ত যে কোনো প্রতিকারের বিষয়ে প্রয়োজনীয় গবেষণা, প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম আয়োজনসহ যে-কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং সেই লক্ষ্যে, ক্ষেত্রমত, প্রয়োজনীয় আইন ও বিধি-বিধান প্রণয়নের বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান;**
৭. **অনগ্রসর ও ঝুঁকিপূর্ণ (ধর্মীয় সংখ্যালঘু, আদিবাসী, নারী, শিশু ইত্যাদি) জনগোষ্ঠীর অধিকার নিশ্চিতকরণ, বাস্তবায়ন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও এর লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা নিশ্চিতের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট কাঠামোবদ্ধ ব্যবস্থা গ্রহণের বাধ্যবাধকতা আরোপ।**

৯. খসড়া আইনে মানবাধিকার-সংক্রান্ত বিষয়ে অন্য কোনো আইন এই আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হলে, কোন আইন প্রাধান্য পাবে, তা অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

সুপারিশ-৯: খসড়া আইনে 'মানবাধিকার-সংক্রান্ত বিষয়ে অন্য কোনো আইন এই আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হইলে, এই আইন প্রাধান্য পাইবে'–এরূপ ধারা যুক্ত করতে হবে।

১০. খসড়া আইনে অভিযোগ তদন্তের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, 'কোনো অভিযোগ দায়ের বা তথ্য প্রাপ্তির পরবর্তী ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে কমিশন কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমিশনার স্বীয় বিবেচনায় আমলে নেওয়ার উপযুক্ত মনে করিলে একজন তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করিবেন' (ধারা-১৬)। এক্ষেত্রে কোনো অভিযোগকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে আমলে না নেওয়া বা রাজনৈতিক বিবেচনায় কোনো ঘটনাকে আমলে নেওয়ার ঝুঁকি তৈরি হবে। এ ছাড়া, গণমাধ্যম বা অন্য উৎস থেকে প্রাপ্ত মানবাধিকার লঙ্ঘন-সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশিত হলে এবং কমিশন বিষয়টি আমলে না নিলে করণীয় কী, তা এই ধারায় সুস্পষ্ট করা হয়নি।

সুপারিশ-১০: খসড়া আইনের ধারা ১৬–তে 'কোনো অভিযোগ প্রাপ্ত হইলে অথবা গণমাধ্যমসহ অন্য যে কোনো মাধ্যম হইতে মানবাধিকার লঙ্ঘন-সম্পর্কিত তথ্যের ভিত্তিতে কমিশন অনুসন্ধান বা তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করিতে পারিবে'–এরূপ ধারা যুক্ত করতে হবে। সেইসাথে 'গণমাধ্যম বা অন্য উৎস হইতে প্রাপ্ত মানবাধিকার লঙ্ঘন-সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশিত হইলে এবং কমিশন বিষয়টি আমলে না নিলে, তাহার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া ওয়েবসাইটে প্রকাশ করিবে'–এরূপ সুস্পষ্ট বিধান যুক্ত করতে হবে।

১১. ২০২৫ সালের অধ্যাদেশের ধারা ১৬ (২)(গ)–তে 'অভিযুক্ত ব্যক্তি সরকারি কর্মচারী বা শৃঙ্খলা-বাহিনীর সদস্য হলে তাকে গ্রেপ্তারের ক্ষেত্রে আদালত বা ট্রাইব্যুনাল বা ক্ষেত্রমত কমিশনের পূর্বানুমতি গ্রহণ করতে হবে এবং এক্ষেত্রে সরকার বা সংশ্লিষ্ট নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতির প্রয়োজন হইবে না' এমন বিধান থাকলেও খসড়া আইনে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা নেই।

সুপারিশ-১১: খসড়া আইনের ধারা ১৬–তে 'অভিযুক্ত ব্যক্তি সরকারি কর্মচারী বা শৃঙ্খলা-বাহিনীর গোয়েন্দা বা অনুরূপ নজরদারি সংস্থার সদস্য হইলে তাহাকে গ্রেপ্তারের ক্ষেত্রে আদালত বা ট্রাইব্যুনাল বা, ক্ষেত্রমত, কমিশনের পূর্বানুমতি গ্রহণ করিতে হইবে এবং এক্ষেত্রে সরকার বা সংশ্লিষ্ট নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতির প্রয়োজন হইবে না'–এরূপ বিধান যুক্ত করতে হবে।

১২. খসড়া আইনে অভিযোগ মধ্যস্থতা ও সমঝোতার মাধ্যমে নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে মধ্যস্থতা ও সমঝোতাকারীর নিয়োগের পদ্ধতি এবং ক্ষমতা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে সরকারের অনুমোদন গ্রহণের বাধ্যবাধকতা রাখা হয়েছে [ধারা-১৮(৩)], যা কমিশনের স্বাধীনতা খর্ব করার ঝুঁকি সৃষ্টি করতে পারে।

সুপারিশ-১২: খসড়া আইনের ধারা ১৮(৩)–এ মধ্যস্থতা ও সমঝোতাকারীর নিয়োগের পদ্ধতি এবং ক্ষমতা, প্রবিধান দ্বারা নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে সরকারের অনুমোদন গ্রহণের বাধ্যবাধকতা-সংবলিত বিধান বাতিল করতে হবে।

১৩. ধারা ২০–এ শৃঙ্খলা-বাহিনী বা এর কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগের ক্ষেত্রে মানবাধিকার কমিশনের স্বাধীন তদন্ত করা এবং এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা সংকুচিত করা হয়েছে। এই ধারায় বলা হয়েছে, 'এই আইনের অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, শৃঙ্খলা-বাহিনী বা ইহার কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগের ক্ষেত্রে কমিশন নিজ উদ্যোগে বা কোনো আবেদনের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বাহিনী প্রধান বা সরকারের নিকট হইতে প্রতিবেদন চাহিতে পারিবে। প্রতিবেদন চাওয়া হইলে সংশ্লিষ্ট বাহিনী প্রধান বা সরকার সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কমিশনের নিকট একটি প্রতিবেদন দাখিল করিবে। প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর কমিশন, সন্তুষ্ট হইলে, এই বিষয়ে আর কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করিবে না; সন্তুষ্ট না হইলে কমিশন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট বাহিনী প্রধান বা সরকারের নিকট সুপারিশ পেশ করিবে।' আইনের এই ধারা মূলত ২০০৯ সালের আইনের সংশ্লিষ্ট ধারার হুবহু প্রতিস্থাপন, যে দুর্বলতার কারণেই "জিএএনএইচআরআই" থেকে বাংলাদেশের জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে কখনোই "এ" স্ট্যাটাস দেওয়া হয়নি। এই ধারা জাতীয় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানের এখতিয়ারের আওতাভুক্ত যে কোনো বিষয় স্বাধীনভাবে পর্যালোচনা-সংক্রান্ত প্যারিস নীতিমালার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। উল্লেখ্য, ২০২৫ সালের অধ্যাদেশে কমিশনকে শৃঙ্খলা বাহিনী বা এর কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে

মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগের ক্ষেত্রে অনুসন্ধান ও তদন্ত করা এবং অনুসন্ধান বা তদন্ত শেষে শাস্তির পরিমাণ, ক্ষতিপূরণ বা প্রশাসনিক আদেশ, দায়ী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়, যা বর্তমান খসড়া থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

সুপারিশ-১৩: ধারা-২০ বাতিল করে কমিশনকে 'শৃঙ্খলা বাহিনী বা এর কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগের ক্ষেত্রে অনুসন্ধান ও তদন্ত করা; এবং অনুসন্ধান বা তদন্ত শেষে শাস্তির পরিমাণ, ক্ষতিপূরণ বা প্রশাসনিক আদেশ, দায়ী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ প্রদান' করার ক্ষমতা সংবলিত বিধান অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

১৪. ৩১-ধারায় 'কমিশনের লিখিত অনুরোধের ভিত্তিতে এবং কমিশনের অনুমোদন সাপেক্ষে, কমিশনের মোট জনবলের ৩০ শতাংশ পর্যন্ত প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তি বা সরকারি কর্মচারীকে, কমিশনে, প্রেষণে নিয়োগ করিতে পারিবে' এমন বিধান যুক্ত করা হয়েছে। প্যারিস নীতিমালার একটি মৌলিক শর্ত হলো মানবাধিকার কমিশনকে সরকারের হস্তক্ষেপ থেকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে হবে এবং তা স্বাধীন হিসেবে প্রতীয়মান হতে হবে। কমিশন বা কমিশনের তদন্ত দলে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত বিপুল সংখ্যক ব্যক্তি বা সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রেষণে নিয়োগ কমিশনের স্বাধীনভাবে কার্যক্রম পরিচালনা বা প্রভাবমুক্ত বা সরকারি হস্তক্ষেপমুক্ত তদন্ত কার্যক্রম নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ঝুঁকি তৈরি করতে পারে। এই ধরনের পদে নিয়োগপ্রক্রিয়াও সর্বদা সবার জন্য উন্মুক্ত, স্পষ্ট, স্বচ্ছ, স্বার্থের দ্বন্দ্বমুক্ত ও যোগ্যতার ভিত্তিতে হতে হবে, যা বর্তমান খসড়ায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

সুপারিশ-১৪: খসড়া আইনের ধারা-৩১ সংশোধন করে 'প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তি বা সরকারি কর্মচারীকে কমিশনে বা কমিশনের তদন্ত দলে প্রেষণে নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সীমা ১০ শতাংশ হইবে, এবং এক্ষেত্রে কী কারণে কমিশন বা কমিশনের তদন্ত দলে সরকারী কর্মচারীদের প্রেষণে নিয়োগ করা হইয়াছে, তাহা প্রকাশ করিতে হইবে। কোনো সরকারি কর্মচারীরকে প্রেষণে নিয়োগের ক্ষেত্রে কমিশনের দ্বিমত থাকিলে কমিশন এই ধরনের নিয়োগ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবে এবং এই ধরনের পদে নিয়োগ-প্রক্রিয়াও সর্বদা সবার জন্য উন্মুক্ত, স্পষ্ট, স্বচ্ছ, যোগ্যতার ভিত্তিতে হইতে হইবে'–এরূপ বিধান যুক্ত করতে হবে।

১৫. খসড়া আইনে কমিশনের আর্থিক স্বাধীনতার ক্ষেত্রে [ধারা-৩৬(১)] বলা হয়েছে, 'সরকার প্রতি অর্থ বৎসরের কমিশনের ব্যয়ের জন্য উহার অনুকূলে নির্দিষ্টকৃত অর্থ বরাদ্দ করিবে; এবং অনুমোদিত ও নির্ধারিত খাতে উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থ হইতে ব্যয় করিবার ক্ষেত্রে সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করা কমিশনের জন্য আবশ্যক হইবে না।' কমিশনের বাজেট একতরফাভাবে সরকারি বরাদ্দের ওপর নির্ভরশীল করা হয়েছে। প্যারিস নীতিমালায় জাতীয় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম নির্বিঘ্নভাবে পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত অর্থায়নের কথা বলা হয়েছে, যার মূল উদ্দেশ্য হবে প্রতিষ্ঠানটিকে নিজস্ব কর্মী ও কার্যালয় পরিচালনায় সক্ষম করা, যাতে এটি সরকারের ওপর নির্ভরশীল না হয় এবং এমন আর্থিক নিয়ন্ত্রণের অধীন না থাকে, যা এর স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ন করতে পারে।

সুপারিশ-১৫: খসড়া আইনের ধারা-৩৬(১) সংশোধন করে কমিশনের আর্থিক স্বাধীনতা নিশ্চিতে "সরকার প্রতি অর্থবছরে কমিশনের ব্যয়ের লক্ষ্যে কমিশন হইতে প্রাপ্ত প্রস্তাব অনুযায়ী তাহার অনুকূলে বাজেটে সংযুক্ত তহবিলের ওপর দায়মুক্ত ব্যয় হিসেবে অর্থ বরাদ্দ করিবে, অনুমোদিত ও নির্ধারিত খাতে উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থ হইতে ব্যয় করিবার ক্ষেত্রে সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করা কমিশনের জন্য আবশ্যক হইবে না। "–এরূপ বিধান যুক্ত করতে হবে।

১৬. নির্বাহী হস্তক্ষেপ থেকে সাংবিধানিক সুরক্ষা প্রদান করার জন্য অধ্যাদেশের ধারা–৩৪ এ সংবিধানের ৮৮ নং অনুচ্ছেদের অধীনে কমিশনারদের প্রদেয় পারিশ্রমিক ও ভাতাদি সংযুক্ত তহবিলের উপর দায়যুক্ত ব্যয় হিসেবে পরিশোধের বিধান রাখা হয়েছিল, যা খসড়া বিলে সম্পূর্ণরূপে বাতিল করা হয়েছে। একইসাথে বাজেটের পরিমাণ এবং কমিশনারদের পারিশ্রমিক উভয়ের ওপরই নির্বাহী বিভাগের পূর্ণ স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, যেখানে কোনো ধরনের পদ্ধতিগত সুরক্ষাব্যবস্থা নেই।

সুপারিশ-১৬: খসড়া আইনে কমিশনের ওপর নির্বাহী হস্তক্ষেপ থেকে সাংবিধানিক সুরক্ষা প্রদান করার জন্য ২০২৫ সালের অধ্যাদেশের ন্যায় 'সংবিধানের ৮৮ নং অনুচ্ছেদের অধীনে কমিশনারদের প্রদেয় পারিশ্রমিক ও ভাতাদি সংযুক্ত তহবিলের ওপর দায়যুক্ত ব্যয় হিসেবে পরিশোধের' বিধান সংযুক্ত করতে হবে।

১৭. ধারা ৩৯–এ স্বার্থের সংঘাতের ক্ষেত্রে অনুসৃত পদ্ধতি-সম্পর্কিত বিধান 'এই অধ্যাদেশের অধীন দায়িত্ব পালনকালে বিবেচনাধীন কোনো বিষয়ে কোনো কমিশনারের স্বার্থ জড়িত থাকে, সেইক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কমিশনার, যথাশীঘ্র সম্ভব, বিষয়টি কমিশনকে অবহিত করিবেন এবং উক্ত বিষয়ে কমিশনের অনুসন্ধান, তদন্ত ও সিদ্ধান্ত গ্রহণপ্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করা হইতে বিরত থাকিবেন' থাকলেও খসড়া আইনে তা বাদ দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়ানোর কোনো বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা রাখা হয়নি, ফলে কমিশনাররা আইন লঙ্ঘন না করেই ব্যক্তিগত স্বার্থসংশ্লিষ্ট সকল সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন, যা প্যারিস নীতিমালায় উল্লিখিত স্বার্থের সংঘাত প্রতিরোধ পদ্ধতি-সম্পর্কিত নীতির পরিপন্থী।

সুপারিশ-১৭: খসড়া আইনে কমিশনের সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়াকে স্বার্থের দ্বন্দ্বমুক্ত রাখার জন্য 'এই আইনের অধীন দায়িত্ব পালনকালে বিবেচনাধীন কোনো বিষয়ে কোনো কমিশনারের স্বার্থ জড়িত থাকিলে, সেইক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কমিশনার, যথাশীঘ্র সম্ভব, বিষয়টি কমিশনকে অবহিত করিবেন এবং উক্ত বিষয়ে কমিশনের অনুসন্ধান, তদন্ত ও সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করা হইতে বিরত থাকিবেন'–এরূপ ধারা যুক্ত করতে হবে।

১৮. খসড়া আইনে বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা সরকারকে প্রদান করা হয়েছে, যা কমিশনের স্বাধীনতাকে খর্ব করে। এর ফলে বিধি জারি না করার মাধ্যমে সরকার কর্তৃক কোনো আইন লঙ্ঘন না করেই কমিশনের কার্যক্রম অচল করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সেইসঙ্গে, প্যারিস নীতিমালায় জাতীয় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানকে অবশ্যই প্রতিটি নিয়মের জন্য সরকারি অনুমোদন ছাড়াই তার নিজস্ব অভ্যন্তরীণ কার্যপ্রণালী ও কার্যপদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হওয়ার কথা বলা হলেও, খসড়া আইনে বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা সরকারকে প্রদান করা হয়েছে, যা প্যারিস নীতিমালার পরিপন্থী।

সুপারিশ-১৮: কমিশনের স্বাধীনতাকে সমুন্নত রাখার জন্য খসড়া আইনের ধারা ৪০ সংশোধন করে 'এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কমিশন, রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে। তবে শর্ত থাকে যে, প্রবিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত, কমিশন লিখিত আদেশ দ্বারা যে পদ্ধতি নির্ধারণ করিবে, কমিশন তাহার কার্য নির্বাহের ক্ষেত্রে উক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করিবে'–এরূপ ধারা যুক্ত করতে হবে।

১৯. ২০২৫ সালের অধ্যাদেশের ধারা ৩১-এ আইনগত কার্যক্রম শাখা-সংক্রান্ত বিধান থাকলেও খসড়া আইনে এ সংক্রান্ত বিধান বা কোনো প্রাতিষ্ঠানিক আইনি সহায়তা কাঠামো নেই। এর ফলে অভিযোগকারীদের নিজেদের আইনি প্রতিনিধিত্বের জন্য অর্থ ব্যয় করতে হবে। সেইসাথে প্যারিস নীতিমালায় কমিশনের কার্যধারা পরিচালনায় অভিযোগকারীদের, বিশেষ করে গরীব ও দুস্থ ব্যক্তিদের আইনি সহায়তা পাওয়ার যে বিধান রাখার কথা বলা হয়েছে, তার সাথেও অসামঞ্জস্যপূর্ণ।

সুপারিশ-১৯: খসড়া আইনে ক্ষতিগ্রস্ত ও ভুক্তভোগী ব্যক্তিদের আইনি সহায়তা নিশ্চিতে 'কমিশনের আইনগত কার্যক্রম শাখা প্রতিষ্ঠা– ১. আইনগত সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে কমিশনের একটি পৃথক শাখা থাকিবে; ২. যেক্ষেত্রে মানবাধিকার লঙ্ঘনের কোনো অভিযোগ বা ঘটনা প্রচলিত আইন বা ব্যবস্থায় কোনো আদালত, মীমাংসা প্রতিষ্ঠান বা অনুরূপ অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কার্যকর সুরাহা করা সম্ভব মর্মে কমিশনের নিকট প্রতীয়মান হয়, সেইক্ষেত্রে কমিশন, উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত শাখার মাধ্যমে, অভিযোগকারীর পক্ষে উপযুক্ত আদালত বা প্রতিষ্ঠানে মামলা বা অন্যান্য আইনগত কার্যধারা দায়ের ও পরিচালনা, অভিযোগকারী ও ভুক্তভোগীর আইনগত সহায়তা ও সুরক্ষা প্রদান এবং প্রয়োজনীয় অন্য যেকোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবে; এবং ৩. কমিশন, মামলা বা আইনি কার্যধারা পরিচালনার জন্য, অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আইনজীবীগণের সমন্বয়ে একটি প্যানেল গঠন করিবে এবং প্রবিধান দ্বারা তাহাদের নিয়োগের শর্ত বা সম্মানীর পরিমাণ নির্ধারণ করিতে পারিবে।'– এরূপ ধারা সংযুক্ত করতে হবে।

****